ইউনিট ৩

মুঘল শাসন (১৫৫৬ - ১৭০৭ খ্রিঃ)

ভূমিকা

সম্রাট মহামতি আকবরের সময় কাল থেকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থিতিশীল অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। এ সময় থেকে সম্রাট আওরঙ্গযেবের শাসনকাল পর্যন্ত (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রিঃ) চারদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। এ যুগের সম্রাটগণের জনহিতকর বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। তা সত্ত্বেও সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মহামতি আকবরের রাজ্য বিস্তার, তাঁর বিভিন্ন নীতি, ভূমি শাসন ব্যবস্থা, পরবর্তী সম্রাটগণের কৃতিত্ব, মুঘল আমলের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন দিক, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

পাঠ ১

মহামতি আকবরের রাজ্য বিস্তার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- আকবরের সাম্রাজ্যের সীমা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বিজয় অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আকবরের সমরাভিযানের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

আকবরের রাজ্যসীমা

পিতা সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৩ বছর বয়সে জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর নাম ধারণ করে দিল্লীর মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্য যুগের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সাম্রাজ্যের সংগঠক ও বিজেতা হিসেবে সম্রাট আকবর অনন্য স্থান দখল করে আছেন। সুলতানী আমলে একমাত্র আলাউদ্দীন খলজী বৃহৎ অঞ্চল জয় করেছিলেন। সম্রাট আকবর ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অব্যাহত রাখেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি হিমালয় থেকে কৃষ্ণা নদী এবং হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে

আরোহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর আদিল শাহ সুরের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করেন। মুঘল শাসনের ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ স্মরণীয় ঘটনা এবং এটা ছিল চূড়ান্ত মিমাংসাক্ষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয় লাভের ফলে ভারতে প্রাধান্য স্থাপনে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর সম্রাট আকবর বৈরাম খানের সাহায্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর অধিকার করেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে মালবরাজ রাজবাহাদুরকে পরাজিত করে আকবরের সেনাপতি আদম খান ও পীর মুহম্মদ মালব জয় করেন।

আকবরের সাম্রাজ্য

বিভিন্ন রাজ্যের উপর আকবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

গন্ডোয়ানা অধিকার- ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেই কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খানকে গন্ডোয়ানা জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। বীরাঙ্গনা রাণীমাতা দুর্গাবতী দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। গন্ডোয়ানা বিজিত হলে বহু ধনরত্ন আসফ খানের হস্তগত হয়।

রাজপুতনা অভিযান- সম্রাট আকবর ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আজমীর যাত্রার সময় অম্বর বা জয়পুরের রাজা বিহারীমলের বশ্যতা লাভ করেন। তিনি বিহারীমলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বিহারীমলের পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহকে মনসবদার রূপে নিয়োগ করেন।

রাজপুতদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন

আকবর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সম্রাট। তিনি রাজপুতদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে আফগানদের ধ্বংসের কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁর এই মৈত্রী নীতি ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইতোমধ্যে যোধপুরও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মেবারের রানা উদয়সিংহ কিছুতেই মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। উপরন্তু উদয়সিংহ পলাতক মালবরাজ রাজবাহাদুরকে আশ্রয় দান করে আকবরের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সুতরাং আকবর ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। উদয়সিংহ নিকটবর্তী পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপসিংহ ও পৌত্র অমরসিংহ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালান। প্রতাপসিংহ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে অমরসিংহ মানসিংহের নিকট পরাজয় বরণ করেন। তাসত্ত্বেও আকবরের জীবদ্দশায় সমগ্র মেবার মুঘল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অত:পর আকবর রনথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানী প্রভৃতি রাজ্য নিজ করায়ত্তে আনেন। রাজপুতনা শান্ত করে আকবর গুজরাট ও সুরাট অধিকার করেন।

বাংলা অধিকার- ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ খান কররাণী মুঘল সেনাবাহিনীর হাতে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার কতিপয় প্রভাবশালী জমিদার মুঘল বাদশার আনুগত্য অস্বীকার করে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। এই প্রভাবশালী জমিদারবৃন্দ ইতিহাসে 'বার ভূইয়া' নামে পরিচিত।

কাবুল ও কান্দাহার জয়- আকবরের ধর্মীয় নীতির বিরোধিতা করে ভারতের কতিপয় মুঘলমান বিদ্রোহী তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা মুহম্মদ হাকিমকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেন। সম্রাট আকবর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে কাবুল আক্রমণ করেন। তিনি বিদ্রোহী ভাইকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। অত:পর আকবর ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার দখল করে রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান জয় করে উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তিনি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বলখ ও বদখশান অধিকার করে আফগান উপজাতি উজবেগ ও ইউসুফজাইদেরকে দমন করে তাঁর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার- সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা, বিদর এবং খান্দেশ এই পাঁচটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে আহমদনগর ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। আকবর প্রথমে দূত পাঠিয়ে এসব রাজ্যের আনুগত্য লাভে চেষ্টা করেন। খান্দেশের সুলতান ব্যতীত অন্য কোন সুলতান মুঘল আনুগত্য স্বীকারে রাজী হননি। তাই আকবর সমরাভিযানে মনোনিবেশ করেন।

১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল মুঘল বাহিনী আহমদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। আহমদ নগরের রাণী চাঁদ সুলতানা আকবরকে বেরার প্রদেশ দান করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ সুলতানার মৃত্যুর পর আহমদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

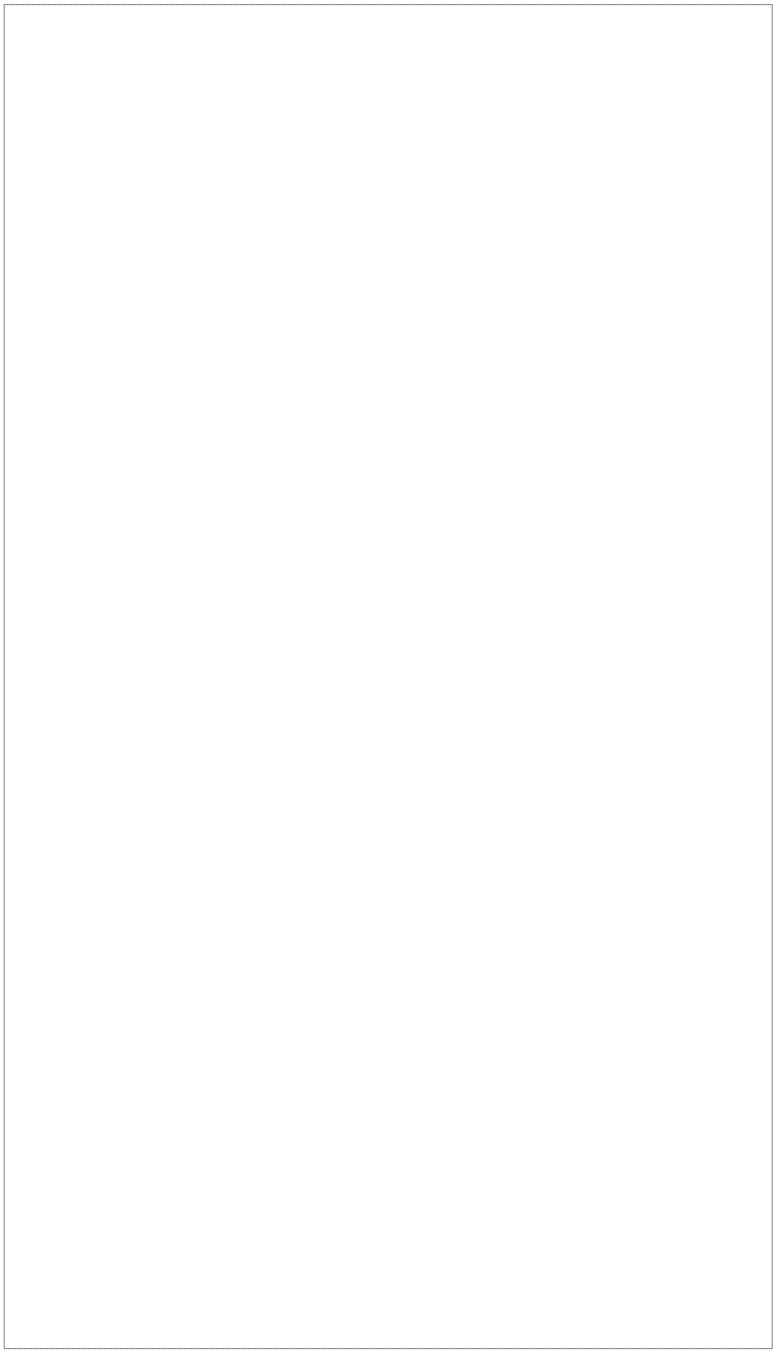

আকবরের ফরমান

ইতোমধ্যে খান্দেশের নতুন সুলতান মীরণ বাহাদুর মুঘল আনুগত্য অস্বীকার করেন। আকবর স্বয়ং খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করেন। মীরন বাহাদুর আত্মরক্ষার্থে সুরক্ষিত আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় নেন।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আকবর কূটনীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও উৎকোচের সাহায্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ আসিরগড় অধিকার করেন। আসিরগড়ই ছিল আকবরের রাজ্যজয় নীতির সর্বশেষ ঘটনা। তিনি আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশ নিয়ে একটি সুবা গঠন করেন এবং যুবরাজ দানিয়েলকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে আসেন। এই ভাবে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল।

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আকবরের দিল্লীর সিংহাসন আরোহণকালীন সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আকবর ৪০ বছর সমরাভিযান পরিচালনা করেন। এ সময়ে তাঁর রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। রাজ্য জয়ে সম্রাট আকবর সম্মুখ সমরের পাশাপাশি কূটনীতিরও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সম্রাট আকবর সমরাভিযান পরিচালনা করেন —
   ক. ৩০ বছর খ. ৩৫ বছর
   গ. ৪০ বছর ঘ. ৪৫ বছর

২. মালব জয় করা হয় —
   ক. ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে

৩. গন্ডোয়ানায় প্রেরিত মুঘল বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন —
   ক. আকবর স্বয়ং খ. বৈরাম খা
   গ. মানসিংহ ঘ. আসফ খাঁ

৪. হলদিঘাটের যুদ্ধে মেবারের রাণা ছিলেন —
   ক. উদয় সিংহ খ. অমর সিংহ
   গ. প্রতাপ সিংহ ঘ. মানসিংহ

৫. বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান পরাজিত ও নিহত হন —
   ক. ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে

৬. আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়কালীন সময়ে ঐ অঞ্চলের স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের সংখ্যা ছিল—
   ক. ২ টি খ. ৩ টি
   গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

৭. আকবরের শেষ সমরাভিযান —
   ক. হলদিঘাটের যুদ্ধ খ. বাংলা বিজয়
   গ. আসিরগড় ঘ. কাবুল ও কান্দাহার বিজয়

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. আকবরের রাজ্য সীমার বিবরণ দিন।

২. আকবরের সময়ে কাবুল ও কান্দাহার বিজয়ের বিবরন লিখুন।

পাঠ ২

আকবরের রাজপুত নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আকবরের রাজপুত নীতির ফলাফলের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুঘলদের ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনকালীন সময়ে এদেশের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল রাজপুত জাতি। জাতিগতভাবে রাজপুতরা ছিল হিন্দু। তারা বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন যোদ্ধা হিসেবে খ্যাত ছিল। সম্রাট আকবর রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি যৌক্তিক রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন। নিম্নে সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি আলোচনা করা হলো।

দুইভাগে বিভক্ত রাজপুত নীতি

সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ **১.** মিলনাত্মক নীতি এবং **২.** যুদ্ধংদেহী নীতি।

মিলনাত্মক নীতি

আকবর রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে উচ্চ পদে নিয়োগ, জিযিয়া ও তীর্থ কর রহিতকরণ, এবং হিন্দু সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা করে মিত্রতা স্থাপন করেন। আকবর স্বয়ং অম্বররাজ বিহারীমলের, বিকানীর ও জয় সিলমিরের রাজপুত কুমারীকে বিয়ে করেন। তিনি ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমের সাথে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যার বিয়ে দেন। রাজার টোডরমল, রাজা বিহারী মল, ভগবান দাস এবং মানসিংহকে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি জিযিয়া ও তীর্থযাত্রীদের কর রহিত করেন। তিনি হিন্দু কবি পণ্ডিত ও চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আকবর হিন্দু সমাজের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহে উৎসাহদান ও সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

যুদ্ধংদেহী নীতি

রাজপুতদের প্রতি মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করলেও আকবর তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বিরোধিতা সহ্য করেননি। তিনি চিতোর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। রনথম্ভোর, যোধপুর, বিকানী, জয় সালমি প্রভৃতি রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রানা প্রতাপসিংহ তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করায় হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপ সিংহের পুত্র অমরসিংহ পরাজিত হলে রাজপুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফলাফল

সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এই নীতির ফলে মুঘল সম্রাটগণ চারপুরুষ ব্যাপী রাজপুতদের সমর্থন ও সেবা লাভ করে। এ ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে এক মিশ্র কৃষ্টির উদ্ভব হয় যার স্পষ্ট ছাপ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে বিদ্যমান। এই নীতির ফলে ভারতবর্ষে উর্দু ভাষা সৃষ্টির পথ সুগম হয়।

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আকবর রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে রাজপুতদের প্রতি শুধুমাত্র মিলনাত্মক নীতি সমর্থন করেননি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর রাজপুত নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতিকে ভাগ করা যায় —
   ক. ১ টি ভাগে খ. ২ টি ভাগে
   গ. ৩ টি ভাগে ঘ. ৪ টি ভাগে

২. যুবরাজ সেলিম ভগবানদাসের কন্যাকে বিয়ে করেন —
   ক. ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে

৩. হিন্দু সমাজের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করেন —
   ক. বাবর খ. হুমায়ুন
   গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. আকবরের রাজপুত নীতির উদ্দেশ্য কী ছিল?

২. রাজপুত নীতির ফলাফল লিখুন?

পাঠ ৩

আকবরের ধর্মনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি গ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনার বিবরণ দিতে পারবেন।
- অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দীন-ই-ইলাহীর বর্ণনা দিতে পারবেন।

সম্রাট আকবর ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত ও পরধর্মসহিষ্ণু। তাঁর ধর্মীয় উদারনীতির পিছনে নিম্নোক্ত প্রভাব বা কারণ কার্যকর ভূমিকা পালন করেঃ

আকবর ছিলেন ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত ও পরধর্ম সহিষ্ণু

১. **গৃহশিক্ষক ও পিতামাতার প্রভাবঃ** আকবরের গৃহশিক্ষক আব্দুল লতিফ উদারপন্থী ছিলেন, তাঁর পিতা ও পিতামহ কেউই গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর মাতা হামিদা বানুও উদার এবং পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। আকবর প্রথম জীবনে শেখ মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈজী এবং আবুল ফজলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। তাঁরা সকলে সুফি ছিলেন। বাল্যকালেই আকবর সুফি ধর্মমতের প্রভাবে আসেন। ফলে তিনি ধর্ম বিষয়ে উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

ষোড়শ শতাব্দী ধর্মীয় অজিজ্ঞাসার যুগ

২. **ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাবঃ** ষোড়শ শতাব্দী ছিল ধর্মান্দোলনের যুগ। এই যুগ ছিল অনুসন্ধিৎসার যুগ। আকবর ছিলেন সে যুগের মূর্ত প্রতীক। কবীর, গুরু নানক, শ্রী চৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ মরমী সাধকগণ আকবরের ধর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। ভারতের ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাব জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। তখন তারা মনে করতেন যে শত বছরের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য পৃথিবীতে একজন ত্রাণকর্তা আগমন করবেন। আকবর এভাবে নিজকে একজন ত্রাণকর্তা মনে করেছিলেন।

৩. **ইবাদত খানায় বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণের আলোচনার প্রভাবঃ** সম্রাট আকবর দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। কিন্তু এইখানে আমন্ত্রিত আলেমগণের আলোচনায় তিনি বিদ্বেষ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, ব্যক্তিগত আক্রমণের মনোভাব ও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা লক্ষ করেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এইভাবে সত্যের সন্ধান করা বৃথা। তাই তিনি 'অভ্রান্ত বা সর্বময় কর্তৃত্বের' ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা দ্বারা সম্রাট রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ক যে কোন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি 'ইমাম-ই-আদিল' খেতাব গ্রহণ করে ফতেহপুর সিক্রির মসজিদে প্রধান ধর্মগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে এর ফলে গোঁড়া সুন্নী মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হন।

৪. **রাজনৈতিক কারণঃ** সম্রাট আকবরের ধর্মীয় মতবাদের উপর রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষ হিন্দু প্রধান দেশ। আর সংখ্যালঘু মুঘলমানরা শাসক গোষ্ঠী। সুতরাং সংখ্যাগুরুর সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করতে হলে ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল ও উদার নীতি গ্রহন করতে হবে। বলাবাহুল্য সম্রাট আকবরের এই উপলব্ধি মুঘল সম্রাজ্যের উপকারে এসেছিল।

দীন-ই-ইলাহী

দীন-ই-ইলাহীর বিষয়বস্তু

বিভিন্ন ধর্মগুরুদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর করার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর ১৫৮২ সালে 'দীন-ই-ইলাহী' নামে একেশ্বরাবাদমূলক এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত গঠিত হয়। এই ধর্মমতের কলেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ'। তাছাড়া-দীন-ই-ইলাহী মতাবলম্বীদিগকে কতকগুলো রীতি-নীতি পালন করতে হত। এই রীতি বা বিধান গুলি ছিলঃ

১. এই ধর্মের সভ্যগন পরস্পর মিলিত হলে, 'আসসালুমু আলাইকুম'। এর পরিবর্তে আল্লাহু আকবার এবং প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম' না বলে 'জাল্লাজালালুহু' বলতে হতো।
২. এই ধর্মীয় বিধান অনুসারে মৃত্যুর পরে নয়, মৃত্যুর পূর্বেই দাওয়াত বা আমন্ত্রনের ব্যবস্থা করতে হবো।
৩. দীন-ই-ইলাহীর সদস্যগনের মাংস ভক্ষন করা নিষেধ।
৪. সভ্যগন নিজ নিজ জন্মদিন পালন করবেন এবং ভোজের আয়োজন করবেন।
৫. সভ্যগন ভিক্ষা প্রদান করবেন কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না।
৬. এই ধর্মতম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা হবে না।

দীন-ই-ইলাহী কোন ধর্ম নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এর প্রবর্তন

ড. ভি. স্মিথের মতে, সংকীর্ণ অর্থে আকবরের দীন-ই-ইলাহী কোন ধর্ম নয়ে। এটি একটি জীবন দর্শন মাত্র। সম্রাট আকবর জোর করে তাঁর ধর্মমত কারও উপর চাপিয়ে দেননি। এ জন্যই দীন-ই-এলাহীর দীক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা বিশজনের বেশী ছিলনা। এই বিশজনের মধ্যে একজন ছাড়া বাকী সকলেই ছিলেন মুসলমান। দীন-ই-ইলাহীর দীক্ষা গ্রহণকারী একমাত্র হিন্দু ছিলেন রাজা বীরবল। দীন এলাহীর মাধ্যমে সকল ধর্মের সারাংশের এক অপুর্ব সংমিশ্রন সাধন করা ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এর পিছনে তাঁর সুচিন্তিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেউ কেউ দীন-ই-ইলাহীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও সাধারণভাবে জনমনে এটি কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই দীন-ই-ইলাহী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সম্রাট আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫ খ্রিঃ) সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মমত বিলুপ্ত হয়।

আকবরের বিখ্যাত সভাসদদের নয়জন (নবরত্ন)

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আকবর ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রভাব তাঁর ধর্মীয় উদার নীতির জন্য দায়ী ছিল। তিনি সব ধর্মের সার নিয়ে দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ মতবাদ তাঁর মৃত্যুর পরপরই বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. ধর্ম আন্দোলনের যুগ হচ্ছে —
   ক. একাদশ শতাব্দী খ. দ্বাদশ শতাব্দী
   গ. ষোড়শ শতাব্দী ঘ. সপ্তদশ শতাব্দী

২. অভ্রান্ত বা সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা দেন —
   ক. আবুল ফজল খ. আকবর
   গ. ফৈজী ঘ. আবদুল লতিফ

৩. আকবর 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন করেন —
   ক. ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে

৪. দীন-ই-ইলাহী গ্রহণকারী আকবরের অমাত্যের সংখ্যা —
   ক. ১৬ জন খ. ১৮ জন
   গ. ২০ জন ঘ. ২২ জন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. কোন কোন ঘটনা আকবরকে একটি বিশেষ ধর্মনীতি গ্রহণে প্রভাবিত করে?
২. দীন-ই-ইলাহী কি, দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?
৩. দীন-ই-ইলাহীর বিধানগুলি আলোচনা করুন।

পাঠ ৪

আকবরের ভূমি শাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- আকবরের আমলের ভূমি জরীপ ও ভূমির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আকবরের রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্যের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট আকবরের রাজস্ব নীতির ফলাফলের উল্লেখ করতে পারবেন।

সম্রাট আকবরের ভূমি শাসন ব্যবস্থা তাঁর রাজত্বকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ সম্রাট আকবরের ভূমি রাজস্ব নীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শেরশাহের রাজস্ব-সংস্কার নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুজাফ্ফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমলের ন্যায় সুযোগ্য দিওয়ানের সাহায্যে আকবর রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তাঁর রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল- ১. জমির শ্রেণী বিভাগকরণ, ২. উৎপন্ন শস্যের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব নির্ধারণ।

ভূমি জরিপ ও ভূমির শ্রেণী বিভাগ

সম্রাট আকবরের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টোডরমল ভূমি রাজস্ব নির্ধারণকল্পে রাজস্ব-সংস্কারে মনোযোগী হন। তিনি জমি জরিপ করার জন্য শেরশাহ কর্তৃক ব্যবহৃত রশির পরিবর্তে দুই দিকে লোহা দ্বারা বাধানো বাঁশের দণ্ড ব্যবহার করেন। তিনি সমগ্র জমি জরিপ করিয়ে উর্বরতা ও কত কাল যাবৎ চাষাবাদ করা হয়-এ সব তথ্যর ভিত্তিতে চাষের জমি সমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করেন। যথা **১. পোলাজ জমি**— এ সমস্ত জমি প্রতি বছর চাষ করা হত। **২. পরাউতি জমি**— এ ধরনের জমি একবার চাষের পর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিছুকাল পতিত রাখা হত। **৩. চাচর জমি**— এ সমস্ত জমি তিন বা চার বছর পর পর চাষ করা হত। **৪. বনযার জমি**— এ ধরণের জমি পাঁচ বছরের জন্য অনাবাদী থাকত।

জমি সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়

প্রত্যেক কৃষকের অধীনে এ ধরণের জমি থাকত। প্রথম দুই ধরণের ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতো। চাচর ও বনযার জমির উপর সামান্য হারে রাজস্ব ধার্য করা হয়। কৃষকগণ নগদ টাকায় অথবা শস্যে খাজনা দিতে পারতো। এই ভূমি রাজস্ব নীতি 'যাবতী' বা টোডরমলের 'রায়তওয়ারী' প্রথা নামে পরিচিত। 'যাবতী' ব্যতীত আরও দু'ধরনের রাজস্ব নীতি প্রচলিত ছিল যথা ১. গাল্লাবকস ২. নাসাখ। গাল্লাবক্স প্রথা অনুসারে যখন যেমন ফসল ফলত সরকার তার ১/৩ অংশ কর হিসেবে পেত। এর ফলে কোন নির্দিষ্ট হারে পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। নাসাখ প্রথা অনুসারে ফসল উৎপাদনের কোন জরিপ না করে আন্দাজের ভিত্তিতে সরকার ও রায়তের মধ্যে ফসল ভাগ করা হত। বাংলাদেশে এ প্রথা চালু ছিল।

রাজস্বের হার নির্ধারন

রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিওয়ান আদায়কৃত রাজস্ব থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুবাদারকে অর্থ প্রদান করতেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের সময় রাজস্ব আদায় শিথিল করা হত। প্রয়োজনে খাজনা মওকুফ করার উদাহরনও আছে। রাজস্ব কর্মচারিদের দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা হতো।

রাজস্ব আদায়

রাজস্ব নীতির ফলাফল

আকবরের প্রবর্তিত রাজস্ব নীতির ফলে কৃষক ও রাষ্ট্র উভয়ই লাভবান হয়। এই ব্যবস্থার ফলে রাজস্ব কর্মচারিগণ কেন্দ্রের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে নীতি মোতাবেক কাজ করতে পারতেন। রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ায় রাষ্ট্রের ঘাটতি রহিত হয় এবং কর্মচারিদের দুর্নীতি বন্ধ হয়। সম্রাট আকবরের সফল রাজস্ব নীতির ফলে কৃষকগণ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে

এবং দেশের কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হয়। ডঃ স্মিথ বলেছেন যে, "সম্রাটের রাজস্ব নীতি ছিল নিখুঁত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়"।

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আকবর রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন এবং ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করান। ভূমির চাষের ধরন অনুযায়ী আবাদী ভূমিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে কর ধার্য করা হয়। এতে সরকার এবং কৃষককুল উপকৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. আকবরের রাজস্বনীতির মূল লক্ষ্য ছিল—
   ক. ১ টি খ. ২ টি
   গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

২. টোডরমলের পদবী ছিল —
   ক. মনসবদার খ. দিওয়ান
   গ. ফৌজদার ঘ. আমিন

৩. আকবর চাষের জমিকে ভাগ করান —
   ক. ১ টি ভাগে খ. ২ টি ভাগে
   গ. ৩ টি ভাগে ঘ. ৪ টি ভাগে

৪. এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব যে ধরনের ভূমি থেকে আদায় করা হত-তার নাম ছিল—
   ক. পোলাজ জমি খ. পোলাজ ও পরাউতি জমি
   গ. চাচর জমি ঘ. বনযার জমি

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. আকবর কিভাবে ভূমি জরিপ ও ভূমির শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন?
২. আকবরের ভূমি রাজস্বনীতির ফলাফল কি হয়েছিল?

পাঠ ৫

জাহাঙ্গীরের শানসনকাল (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) ও তাঁর কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের জনহিতকর কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বর্ণনা দিতে পারবেন।

সামরিক সাফল্য

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম 'নুরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আকবরের মত তাঁর বিরাট প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব না থাকলেও তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান, বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন এবং মেবার জয় করেন। এছাড়াও তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

জনহিতকর কাজ

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে স্নেহপ্রবণ, দয়ালু ও বুদ্ধিমান শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি কতগুলো জনহিতকর কাজ দ্বারা প্রজা সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে ছিলেন। যাঁরা সম্রাটের সিংহাসন লাভে সহায়তা করেন তিনি তাঁদেরকে পদোন্নতি প্রদান করেন। পাশাপাশি যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল তিনি তাদের প্রতি উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তাছাড়া সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার আমলের অনেকগুলি নির্যাতনমূলক আইন রহিত করেন এবং দস্তুর-উল-আমল নামে ১২টি আইন প্রণয়ন করে দয়া ও উদারতা প্রদর্শন করেন। রাজ্যের একজন সাধারণ প্রজাও সরাসরি সম্রাটের বিচারপ্রার্থী হতে পারতেন। ধনী ও দরিদ্র সকলেই যাতে তাঁর নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হতে পারে সেজন্য সম্রাট ষাটটি ঘন্টাযুক্ত একটি সোনার শিকল আগ্রার প্রাসাদ থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। যে কোন বিচার প্রাথী শিকলে টান দিলে ষাটটি ঘন্টা একসাথে বেজে উঠত এবং সম্রাট যেখানেই থাকুন না কেন দরবার কক্ষে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থীর অভিযোগ শুনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দক্ষ শাসন, উদারতা, প্রজা কল্যাণমূলক নীতি

চরিত্রে বৈপরীত্যের সংমিশ্রন

প্রজাদের প্রতি এমনি দয়া ও মহানুভবতা সত্ত্বেও সম্রাটের চরিত্রে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্রে দয়া-দাক্ষিণ্য ও কোমলতার পাশাপাশি শত্রু দমনে ও অপরাধীর শাস্তি বিধানে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি ও বাণিজ্য নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। ফকির, দরবেশ, জ্ঞানী-গুণীদের তিনি সমাদর করতেন। সাহিত্য, শিল্পকলা ও চিত্রশিল্পে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট নিজে চিত্রকর ও কবি ছিলেন। ফারসী ও তুর্কী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' রচনা করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর রাজত্বকালে সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতার দরুন তাঁর শাসনামলকে অনেকে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলে অভিহিত করেন। সম্রাটের এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও মদ্যপান করা এবং অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। রাজত্বের শেষভাগে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও তাঁর ভাই আসফ খান সম্রাটের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে গোলযোগ দেখা দেয়।

শিল্প প্রেমিক জাহাঙ্গীর এবং তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা

ইউরোপের বণিক ও পর্যটকদের আগমন

ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তিনি ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের সব রকমের ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও ইংরেজ বণিকদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং সুরাটে কারখানা নির্মাণের অনুমতি দেন। ক্যাপ্টেন হকিন্স ও টমাস রো নামক দু'জন ইংরেজ দূত ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের পত্র নিয়ে হাজির হন। এসকল দূতরা ভারতবর্ষে ব্যাবসা বাণিজ্যের জন্য সম্রাটের নিকট থেকে সুবিধা আদায় করেন। টমাস রো ও তাঁর সহকারী এডওয়ার্ড টেরী জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও প্রজারঞ্জক সম্রাট, তবে প্রয়োজনে তিনি কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে পারতেন। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৫

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজত্ব করেন —
   ক. ১৯ বছর খ. ২১ বছর
   গ. ২২ বছর ঘ. ২৫ বছর

২. বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের সুবিধার জন্য ষাট ঘন্টাযুক্ত সোনার শিকল ঝুলিয়ে দেন —
   ক. আকবর খ. জাহাঙ্গীর
   গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব

৩. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইংরেজ বণিকগণ কারখানা নির্মাণ করেন —
   ক. মাদ্রাজে খ. গোয়ায়
   গ. কলিকাতায় ঘ. সুরাটে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. সম্রাট জাহাঙ্গীরের জনহিতকর কার্যাবলীর বর্ণনা দিন।
২. সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি ও বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইউরোপীয় দূত বা বণিকদের আগমন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ ৬

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে পারবেন।
- উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ফলাফলের উল্লেখ করতে পারবেন।
- উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম ও শাহরিয়ারের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শ্বাশুড়ি নুরজাহানের প্ররোচনায় শাহরিয়ার লাহারে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। শাহজাদা খুররমের শ্বশুর আসফ খান নিজ জামাতাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে পরাজিত করেন এবং অন্ধ করে দিয়ে সিংহাসনের অনুপযুক্ত করে দেন। এমতাবস্থায় শাহজাদা খুররম দাক্ষিণাত্য থেকে আগ্রায় ফিরে আসেন এবং ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি 'আবুল মুজাফফর শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তবে তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরাধিকার প্রশ্নে সম্রাটের চার পুত্রের মধ্যে গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

সম্রাট শাহজাহান

পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ঃ সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ সম্রাটের প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং তিনি পিতার সাথে আগ্রাতে অবস্থান করছিলেন। অন্য তিন পুত্রের মধ্যে সুজা বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় দারা শিকোহ অসুস্থ সম্রাটের শয্যাপাশে থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। দীর্ঘ সময় রাজকার্যে সম্রাটের অনুপস্থিতি এবং দারাশিকোর ক্ষমতা গ্রহণের স্পৃহা বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। উত্তরাধিকার যুদ্ধে শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহান আরা দারাশিকোর পক্ষ এবং কনিষ্ঠ কন্যা রওশন আরা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ

১. **সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব-** মুঘলদের সিংহাসন লাভের কোন সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। এই জন্য সিংহাসন নিয়ে বিরোধ এবং ভ্রাতৃ কলহ পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের আমলেও সংঘটিত হয়েছিল। সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবেই শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যেও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

২. **ভাইদের প্রতি দারার অশোভন আচরণ-** সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার খবর দারা গোপন রাখেন এবং রাজধানী আগ্রার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেন। দারার এমনি ধরনের আচরণ ভ্রাতৃবিরোধ অনিবার্য করে তোলে।

৪. **দারার প্রতি শাহজাহানের অন্ধ স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব-** সম্রাট শাহজাহান দারার প্রতি সমর্থন জানান এবং তাঁর সিংহাসন লাভের জন্য আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেন। তিনি দারার পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ে বাধা দেন। তাঁর এই অন্ধস্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগায়।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান ঘটনাবলী ও ফলাফল

শাহজাহানের পুত্রদের দিল্লীর সম্রাট হওয়ার প্রতিযোগিতা

রাজকার্য থেকে দীর্ঘ সময় সম্রাটের অনুপস্থিতি এবং দারার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে বাংলার শাসনকর্তা সুজা ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম নিজকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং সসৈন্য রাজধানী আগ্রা দখল করতে অগ্রসর হলে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে দারার সৈন্য দ্বারা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে সুজা বাংলায় ফিরে যান এবং পরে আরাকানীদের হাতে নিহত হন।

অন্যদিকে মুরাদ গুজরাটে নিজকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ছিলেন ধীরস্থির ও বিচক্ষণ প্রকৃতির। তিনি অন্য ভাইদের মত নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেননি। তবে ভগ্নি রওশন আরার ম্যাধমে আগ্রার পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন। কুটকৌশলে তিনি শাহজাদা মুরাদকে নিজ দল ভূক্ত করেন। ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবার উদ্দেশ্যে মুরাদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাটে সম্রাট বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে সম্রাট বাহিনী পরাজিত হয়। এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে দারাশিকো বিশাল বাহিনীসহ ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সামুগড়ে ভ্রাতাদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হন এবং দিল্লীতে পলায়ন করেন। সামুগড়ের যুদ্ধেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা হয়ে যায়। এরপর অন্য কোন ভাইয়ের পক্ষে আওরঙ্গজেবকে পরাজিত করার আর কোন সামর্থ ছিল না।

শাহজাহান গৃহবন্দী ও আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা গ্রহণ

দারাকে অনুসরণ করে আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করেন। তিনি এবার বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে নজরবন্দী করেন। মুরাদের কার্যকলাপ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আওরঙ্গজেব তাঁকেও কৌশলে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। অতঃপর ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব 'আবুল মোজাফ্ফর মহিউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশা গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন অভিযোগের কারণে দারা এবং মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং পিতা শাহজাহানকে গৃহবন্দী করা হয়। এইভাবে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ

সম্রাট শাহ্জাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেবের সফল্যের পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলি বিশেষ সহায়তা করেছে। তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে সব দিক থেকেই ছিলেন যোগ্যতম। তিনি ছিলেন ধীর স্থির ও কুটনীতি জ্ঞান সম্পন্ন। তিনি ছিলেন গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শী সমরকৌশলে নিপুন এবং রাজ্যশাসনে পারদর্শী। সুচতুর ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন আওরঙ্গজেবের উদারনীতি, রাজনৈতিক দক্ষতা ও সমরকৌশলে অনভিজ্ঞ দারার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন শক্তি ছিলনা। আওরঙ্গজেবের উন্নত সেনাপতিত্ব ও সমরদক্ষতার নিকট অযোগ্য শাহজাদা সুজা ও মুরাদের পরাজয় ছিল অনিবার্য। তদুপরি গোঁড়া মুসলিম হিসেবে সুন্নী আলেম ওলেমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা আওরঙ্গজেবের সাফল্যে সহায়ক হয়েছিল।

সার-সংক্ষেপ

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সংঘাত ঘটে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোহ পিতার স্নেহভাজন ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে আওরঙ্গজেব জয়ী হন এবং দিল্লীর সম্রাটরূপে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সম্রাট শাহজাহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো অবস্থান করছিলেন —
   ক. দিল্লীতে খ. আগ্রায়
   গ. বাংলায় ঘ. গুজরাটে

২. সম্রাট শাহজাহান তার পুত্রদের মধ্যে অধিক স্নেহ করতেন —
   ক. সুজাকে খ. মুরাদকে
   গ. আওরঙ্গজেবকে ঘ. দারাশিকোহকে

৩. বাহাদুর গড়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয় —
   ক. ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে

৪. মুরাদ নিজকে ভাতরবর্ষের স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা দেন —
   ক. বাংলায় খ. দাক্ষিণাত্যে
   গ. গুজরাটে ঘ. কাবুলে

৫. শাহ সুজা মারা যান —
   ক. গুজরাটে খ. কাবুলে
   গ. দাক্ষিণাত্যে ঘ. আরাকানে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ সমূহ বর্ণনা করুন।

২. উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী কি ছিল? এই দ্বন্দ্বের ফলাফল উল্লেখ করুন।

৩. উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ আলোচনা করুন।

পাঠ ৭

শাহজাহানের কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- বিজেতা ও শাসক হিসেবে শাহজাহানের কৃতিত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট শাহজাহানের আমলে স্থাপিত স্থাপত্য শিল্পের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল শাসনামলের স্বর্ণযুগ বলার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।

মুঘল ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের জীবনালেখ্য বৈচিত্রময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। একজন জনপ্রিয় সম্রাটরূপে তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর শাসনামল মুঘল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত।

শাহজাহানের সামরিক সাফল্য

সমরকুশলী হিসেবে সম্রাট শাহজাহান দক্ষতার পরিচয় দেন। মুঘল আধিপত্য বিস্তারেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর আমলে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পর্তুগীজদের দমন করে হুগলী দখল করেন।

দক্ষ শাসন ব্যবস্থা

সম্রাট শাহজাহানের শাসন ব্যবস্থা ছিল আকবরের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। সুশাসন, ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য শাহজাহানের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাসনামলে দুই একটি ঘটনা ছাড়া দেশের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগ নিজে তদারক করতেন এবং প্রজাদেরকে সন্তানতুল্য বিবেচনা করতেন। তবে অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তি দানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম পশ্চিম এশিয়ার এবং ইউরোপের সাথে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি অত্যধিক করের বোঝা হ্রাস করে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের পথ সুগম করেন।

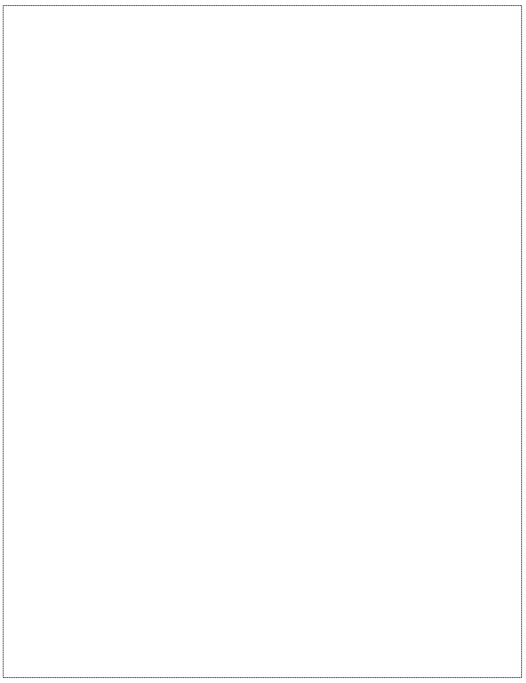

তাজমহল

স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পের বিকাশ

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্য পিপাসু শিল্পী মনের মানুষ। The Prince of Builder নামে খ্যাত সম্রাট শাহজাহানের আমলে মুঘল শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তার স্ত্রী অকাল প্রয়াত মমতাজমহলের সমাধীর উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ তাজমহল বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম একটি নিদর্শন। দেশী বিদেশী কুড়ি হাজার শিল্পী কারিগরের বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত তাজমহলকে ঐতিহাসিক হ্যাভেল ভারতের 'ভেনাস দ্যা মিলো' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া মতি মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, জামে মসজিদ তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম কীর্তি। শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন তাঁর শিল্পানুরাগের এক অপূর্ব নিদর্শন। 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটি নতুন নগর তিনি নির্মাণ করান যা বর্তমানে নতুন দিল্লী নামে পরিচিত। এ সকল স্থাপত্য নির্দশনের নির্মাণ কৌশলে ভারতীয় ও পারসিক স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সময়ে চিত্র শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তিনি হস্তলিপি বিদ্যারও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

স্বর্ণযুগ

ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, আড়ম্বর-ঐশ্বর্য, স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি কারণে শাহজাহানের রাজত্বকাল গৌরবের স্বর্ণ শিখরে উন্নীত হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক তাঁর রাজত্বকালকে মুঘল ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে

জাঁকজমক ও ব্যয় বাহুল্যের অন্তরালে তাঁর আমলেই মুঘল শাসনামলের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

মুঘল শাসনামলের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। তাঁর আমলে রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। দেশে শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের স্থাপত্য শিল্পে এক অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট জাঁকজমকপূর্ণ দরবার বজায় রাখেন। এ সব কারণে মুঘল ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. মুঘল সম্রাটের শাসনামল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত —
   ক. হুমায়ুনের খ. আকবরের
   গ. জাহাঙ্গীরের ঘ. শাহজাহানের

২. ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন —
   ক. আকবর খ. জাহাঙ্গীর
   গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব।

৩. সম্রাট শাহজাহান যে চিত্রশিল্প রীতি অনুসরণ করেন; তার নাম —
   ক. পারসিক খ. আরবীয়
   গ. ভারতীয় ঘ. হিন্দু ও ইউরোপীয়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. বিজেতা ও শাসক হিসেবে সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব বিচার করুন।
২. স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে সম্রাট শাহজাহানের অবদান কি ছিল?
৩. সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কালকে মুঘল শাসনামলের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

পাঠ ৮

আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ : তাঁর দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিন ভারতে রাজ্য বিস্তার নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।

সম্রাট শাহজাহানের জীবদ্দশায় সংঘটিত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ আলমগীর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর শাসনামলে সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয় ছিল দাক্ষিনাত্য নীতি।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি একটি বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর এই নীতি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যান্যদের ধারণা এই যে, তাঁর নীতির মূল উদ্দেশ্য

মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। এ ছাড়াও সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বা অভিযানের অন্যান্য কারণ হচ্ছে :

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের কারণ

১. দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ ছিল।
২. গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানগণ কর দিতে অস্বীকৃতি জানালে সম্রাট তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।
৩. মারাঠা নেতা শম্ভুজী সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান করলে তাঁকে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যে অভিযান অনিবার্য হয়ে পড়ে।
৪. দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা এ সময় খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেন।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারত অভিযান

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় তিন পর্যায়ে বিভক্ত

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়কে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত পর্যায়: সিংহাসনে আরোহণ থেকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা পর্যন্ত। মারাঠা বীর শিবাজী দাক্ষিণাত্যে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠলে আওরঙ্গজেব তাঁকে দমন করার জন্য প্রথমে শায়েস্তা খানকে এবং পরবর্তী সময়ে দিলীর খান ও জয়সিংহকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযান সফল হলেও মারাঠা শক্তিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে দমন ও শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করেন। তৃতীয় পর্যায়ে ১৬৮৭ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব শম্ভুজী ও অন্যান্য মারাঠা নেতার ক্ষমতা ধ্বংস সাধন করেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘ ২৫ (১৬৮২-১৭০৭ খ্রি:) বছর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে শম্ভুজী পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব

দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে আওরঙ্গজেব ভারত উপমহাদেশের একচ্ছত্র সার্বভৌম সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর রাজ্যসীমা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

১. আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করেন এবং এতে পরোক্ষভাবে মারাঠা শক্তি উত্থানের পথ উন্মুক্ত করে দেন। বস্তুত বিজাপুর ও গোলকুন্ডা ছিল মারাঠাদের স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বি। মুঘলদের নিকট এদের পরাজয়ের ফলে মারাঠারা প্রাথমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতমুক্ত হয়ে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।
২. দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। ফলে কেন্দ্র থেকে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

৩. দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ সময় সম্রাটের অবস্থানের কারণে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আফগান, জাঠ, মেওয়াটি, শিখ ও রাজপুতরা মুঘল প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে।

৪. মারাঠা ও অন্যান্য শত্রুদের সাথে অবিরাম যুদ্ধের ফলে রাজকোষে চরম অর্থ সংকট দেখা দেয়। কৃষি ও ব্যবসায়-বানিজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ অবস্থা মুঘল রাজকোষের উপর দারুন চাপ সৃষ্টি করে। রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় সৈন্যদের বেতন বকেয়া পড়তে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অসন্তোষ দেখা দেয়। তাই কোন কোন ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সম্রাট সব কিছু লাভ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুই হারালেন। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন, দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের খ্যাতি ও দেহের সমাধি ক্ষেত্র রচিত হয়।

আওরঙ্গজেবের সময় মুগল সামাজ্য

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হলেও দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুঘল বাহিনীর কাছে মারাঠা নেতা শিবাজী ও শম্ভুজী পরাজিত হলেও মারাঠা শক্তির পুরোপুরি ধ্বংস সাধন সম্ভব হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শম্ভূজী হচ্ছেন —
   ক. রাজপুত নেতা খ. মারাঠা নেতা
   গ. জাট নেতা ঘ. শিখ নেতা

২. সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রথমে যে সেনাপতির অধীনে অভিযান প্রেরণ করেন; তার নাম —
   ক. দিলীর খান খ. জয়সিংহ
   গ. শায়েস্তা খান ঘ. মানসিংহ।

৩. আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন —
   ক. ২০ বছর খ. ২২ বছর
   গ. ২৫ বছর ঘ. ২৭ বছর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণের কারণ কি ছিল?
২. দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল বর্ণনা করুন।

পাঠ ৯

আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- সেনাপতি ও শাসক হিসেবে আওরঙ্গজেবের কৃতিত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ধার্মিক মুঘলমান ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আওরঙ্গজেবের কৃতিত্বের উল্লেখ করতে পারবেন।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাটদের মধ্যে অদ্বিতীয় এবং কৃতিত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেছেন আওরঙ্গজেব মুঘল বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি আকবর অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য শাসন ও বিশালতর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি সরল ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন। কুরআন শরীফ নকল করে এবং নিজ হাতে টুপি সেলাই করে অর্জিত অর্থ দিয়ে তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমন শাসক বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। কোন কোন ঐতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ধর্মান্ধ ও গোঁড়া মুঘলমান হিসেবে অভিযুক্ত করলেও নিঃসন্দেহে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ সম্রাট ছিলেন। রাজ্য শাসনকে তিনি সম্রাটের একটি সুমহান কর্তব্যকর্ম বলে মনে করতেন। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নিজের সুখ-সুবিধা অপেক্ষা প্রজাদের সুখ শান্তির কথা বেশি ভাবতেন। তিনি রাজনীতি দ্বারা ধর্মকে কলুষিত করেননি। তাই ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁকে 'জিন্দাপীর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব ছিলেন সাধারণ জীবন যাপনকারী একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান

সামরিক ও প্রশাসনিক সাফল্য

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সুদক্ষ সমর নায়ক। সেনাপতি হিসেবে তাঁর ছিল অদম্য সাহস, অক্লান্ত কর্মশক্তি এবং উদ্দেশ্য অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনে খুব কম যুদ্ধেই তিনি পরাজয় বরণ করেছিলেন। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল জয় তাঁর সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন আদর্শবান শাসক ছিলেন। রাজ্যের শাসনকার্যে তিনি কোন অবহেলা প্রদর্শন করেননি। প্রশাসনের সকল ব্যবস্থা তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি আইন-কানুন প্রয়োগে কঠোরতা অবলম্বন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বেশ কিছু কর রহিত করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব ছিলেন সফল বিজেতা ও সফল প্রশাসক

শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষাবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

জ্ঞান-শিক্ষা ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক

পবিত্র কুরআন তাঁর মুখস্থ ছিল এবং বহু হাদিস তাঁর জানা ছিল। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ 'ফতোয়া-ই-আলমগিরী' প্রণীত হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন। তবে শাসক হিসেবে তিনি তেমন সফল ছিলেন না। তিনি বীর সৈনিক ছিলেন সত্য, তবে পরিণামদর্শী জননেতা ছিলেন না। বহুলাংশে তাঁর রাজনৈতিক অদুরদর্শীতার জন্যই তার মৃত্যুর পূর্বেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ এ প্রক্রিয়ার পথ তরান্বিত করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সময় রেখা (১৬৫৮ - ১৭০৭ খ্রিঃ)

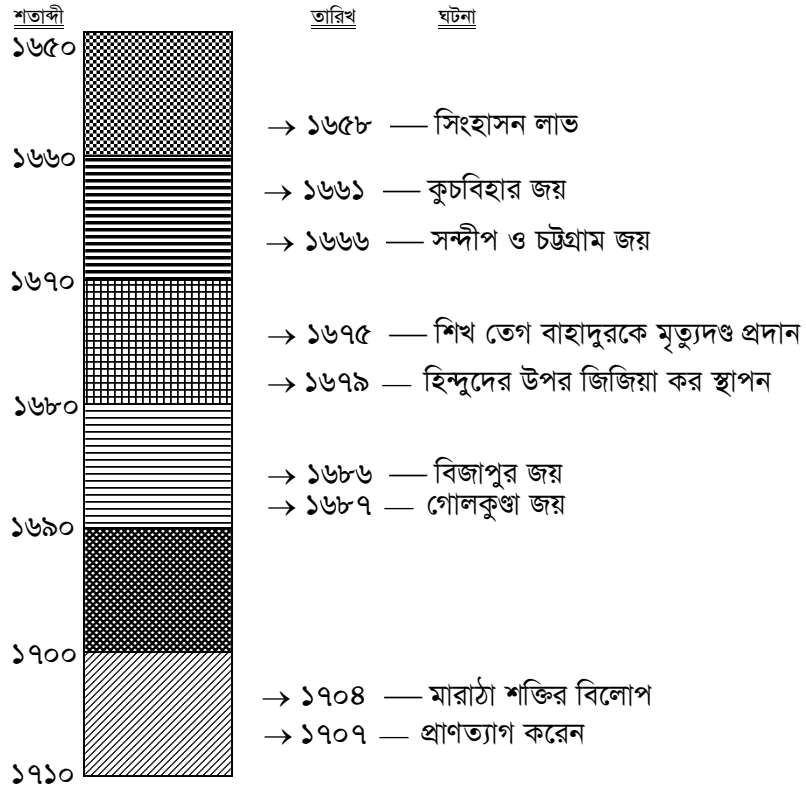

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ৪৯ বছর। এই ৪৯ বছর রাজত্বকালের প্রতি ১০ বছরকে একেকটি ঘর ধরে একটি সময় রেখা অঙ্কন করা হল। এই রেখার উপরের প্রাপ্তকে অতীত এবং প্রান্তকে বর্তমান দিক নির্দেশনার প্রতীক হিসেবে ধরা হল।

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন আদর্শবান সম্রাট ছিলেন। সফল সমর নায়ক হিসেবেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না, তবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর বহু গুণাবলী সত্ত্বেও মুঘল সাম্রাজ্যের পতন তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৯

নৈর্ব্যক্তিত প্রশ্নঃ

১. নিজ হাতেটুপি সেলাই করতেন মুঘল সম্রাট —
   ক. আকবর খ. জাহাঙ্গীর
   গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব

২. ধর্মপ্রাণ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মুঘলমানগণ উপাধি দেন —
   ক. গাজী খ. আলমগীর
   গ. জিন্দাপীর ঘ. বাদশাহ।

৩. ফতোয়া-ই-আলমগিরী হচ্ছে —
   ক. আত্মজীবনী খ. অনুবাদ গ্রন্থ
   গ. ফেকাহ শাস্ত্র ঘ. রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত শাস্ত্র।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. সেনাপতি ও শাসক হিসেবে আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আওরঙ্গজেবের ভূমিকা কি ছিল?

মুঘল যুগের প্রশাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুঘল শাসনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুঘল সম্রাটের ক্ষমতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন মুঘল প্রশাসনিক বিভাগের কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

মুঘল শাসনব্যবস্থা এক-কেন্দ্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী হলেও জনকল্যাণকামী ছিল। এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রধানত সামরিক প্রকৃতির। তাই একমাত্র সদর ও কাজী ছাড়া অন্য সব কর্মচারিকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। মুঘল শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি রচিত হয় আরব-পারস্য শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে।

এককেন্দ্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী হলেও মুগল শাসন ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণকামী

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস ছিলেন সম্রাট। তিনি একাধারে রাষ্ট্রীয় প্রধান, সামরিক প্রধান এবং প্রধান বিচরক হিসেবে সাম্রাজ্যের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন। সকল রাজকর্মচারি তাদের স্ব স্ব কার্যাদির জন্য সম্রাটের নিকট দায়ী থাকতেন। কর্মচারিদের চাকরির কার্যকাল সম্রাটের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করত।

দফতর সৃষ্টি

শাসন ব্যবস্থাকে অধিক দক্ষ করার উদ্দেশ্যে কতগুলি দফতর সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক দফতর একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হত।

ভকিল বা ওয়াজিরের পদ

সম্রাটের পরই প্রধানমন্ত্রী বা ভকিল বা ওয়াজিরের স্থান ছিল। তিনি কোন কোন সময় রাজস্ব দফতর দেখাশুনা করতেন। তবে মুঘল প্রশাসনের ভকিলের পদ অপরিহার্য ছিল না। তাই মুঘল আমলে সব সময় ভকিল নিযুক্তও ছিলেন না।

মুঘল আমলের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ

১. মুঘল আমলের রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কার্যভার দিউয়ানের ওপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালনা ও পরিদর্শন করতেন। এছাড়াও তিনি সরকারি অফিসার ও সম্রাটের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন। দিউয়ান-ই-খালাসা, দিউয়ান-ই-জায়গীর ও দিউয়ান-ই-তাউজিব পদবীধারী কর্মকর্তাগণ দিউয়ানকে সহযোগিতা করতেন।

২. মীর বকসি ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ রাজকর্মচারি। সৈন্য সংগ্রহ, অশ্ব পরিদর্শন, মনসবদার প্রভৃতি কর্মচারির তালিকা সংরক্ষণ প্রভৃতি তাঁর দায়িত্ব ছিল।

৩. মীর-ই-সামান ছিলেন সম্রাটের গৃহ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি। তিনি সম্রাটের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য প্রভৃতি তদারক করতেন।

৪. সদর-উস-সুদূর ছিলেন ধর্মীয় সম্পত্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দান বিভাগের অধিকর্তা।

৫. কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাটের অধীনে সর্বোচ্চ বিচারপতি। তিনি প্রাদেশিক কাজী নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। মুফতি তাঁকে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন।

এছাড়াও অন্যান্য রাজকর্মচারীর মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হত এবং জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধান করা হত।

প্রাদেশিক শাসন

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনের উদ্দেশ্যে সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতগুলো 'সুবা' বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। সুবাহদার পদবীধারী কর্মকর্তা ছিলেন সুবাহর প্রধান কর্ম নির্বাহক। পদমর্যাদায় সুবাহদারের পরেই ছিল প্রাদেশিক দিউয়ান। প্রদেশের আর্থিক উন্নতি এবং রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা ছিল দিউয়ানের দায়িত্ব। এ দুজন প্রধান কর্মকর্তা ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সদর ও কাজী, বক্সী, ওয়াকিয়া নবিস, কোতোয়াল ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য কর্মচারী। মুঘল আমলে প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি সরকার বা জেলায় এবং প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। ফৌজদার ও শিকদার ছিলেন যথাক্রমে সরকার ও পরগণার প্রধান নির্বাহীকর্তা।

সার-সংক্ষেপ

মুঘল শাসন ব্যবস্থার ভিত রচনা করেন সম্রাট আকবর। এ শাসন ব্যবস্থা ছিল মূলত এককেন্দ্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী। সম্রাট এ শাসন ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন। তবে তিনি বিভিন্ন রাজ কর্মচারির সাহায্যে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১০

নৈর্ব্যক্তিত প্রশ্নঃ

১. মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সর্বময় ক্ষমতার উৎস ছিলেন —
   ক. ভকিল খ. সম্রাট
   গ. সুবাদার ঘ. কাজী-উল-কুজ্জাত।

২. মুঘল শাসন ব্যবস্থায় দিউয়ানের কাজ ছিল —
   ক. দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা খ. সৈন্য সংগ্রহ করা
   গ. বিচার করা ঘ. অর্থনৈতিক বিভাগ পরিচালনা করা

৩. সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মচারি ছিলেন —
   ক. দিউয়ান খ. মীর-ই-সামান
   গ. মীর বকসি ঘ. কাজী-উল-কুজ্জাত।

৪. সুবাহর প্রধান কর্ম নির্বাহক ছিলেন—
   ক. ফৌজদার খ. শিকদার
   গ. সুবাহদার ঘ. দিউয়ান

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. মুঘল শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি ছিল?
২. মুঘল শাসন যুগে কেন্দ্রীয় প্রশাসন কেমন ছিল?
৩. মুঘল শাসন যুগে প্রশাসনিক বিভাগ সমূহের পরিচয় দিন।
৪. মুঘল শাসন যুগে প্রাদেশিক সরকারের ধারনা দিন।

পাঠ ১১

মুঘল আমলের অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- মুঘল আমলের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুঘল আমলের দ্রব্যমূল্যের উল্লেখ করতে পারবেন।
- মুঘল যুগের বাণিজ্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সমকালীন ফার্সি সাহিত্য, ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদি থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া বাবরনামা, হুমায়ুন নামা, আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা'-তে উল্লিখিত মুঘল আমলের আর্থিক সচ্ছলতার প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা যায়। জানা যায় আকবরের আকিকার সময় এক টাকায় চারটি ছাগল ক্রয় করা হয়েছিল।

মুগল আমলের বিভিন্ন গ্রন্থে অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র

কৃষি ও রাজস্ব নীতি

বিভিন্ন ধরণের রাজস্ব

মুঘল যুগে কৃষিই ছিল জনগণের প্রধান জীবিকা ও সাম্রাজ্যের রাজস্বের প্রধান উৎস। মুঘল আমলে জাবতি, গাল্লাবকস, নাসাব প্রভৃতি প্রথা অনুসারে রাজস্ব আদায় হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে নগদে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের এক অংশ আদায় করা হত যা পরবর্তী আমলে বাড়তে থাকে।

মুঘল আমলে জিনিষপত্রের দাম খুব কম ছিল। আকবরের আমলে টাকায় ১৫ মন গম এবং ১০ মন চাল বিক্রি হত। সারা বাংলায় শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৭/৮ মন চাল বিক্রি হত। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজি, জীব-জন্তুর দামও খুব সস্তা ছিল।

জনহিতকর কার্য ও বাণিজ্য-নীতি

জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ : আমদানি ও রপ্তানি নীতি

মুঘল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। জল ও স্থল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। মুঘল সম্রাটগণ রাস্তার দুই পাশে পথিক ও বণিকদের সুবিধার্থে কূপখনন, বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্রাজ্যের আর্থিক প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরগুলোর দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। মুঘল আমলে বিদেশ থেকে হাতির দাঁত, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধি, সিল্ক ও রেশম আমদানি করা হত আর ভারতবর্ষ থেকে নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যেমন সূতীবস্ত্র, মসলিন, চিনি, নীল, আফিম ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আয় করা হত। সুরাট, মসলি পট্টম, বোম্বাই, চট্টগ্রাম, কালিকট প্রভৃতি মুঘল আমলের বিখ্যাত ও ব্যস্ততম বাণিজ্য বন্দর ছিল। মুঘল আমলে মুদ্রার প্রচলন ছিল। এ যুগের মুদ্রা সাধারণত ফুলুস নামে পরিচিত ছিল।

কৃষির উন্নতি

মুঘল শাসনামলে সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জনসাধারণ প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলা-বিহারে ধান ও ইক্ষু এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কার্পাস, পশম ও তামাক উৎপন্ন হত। তাছাড়া গম, বার্লি, যব ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো।

মুঘল আমলে মানুষের আর্থিক অবস্থা

মুঘল যুগে সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বণিক ও ব্যবসায়ী সমন্বয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ আমলে রাজদরবার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল। বাংলার কুটিরশিল্পের মধ্যে মসলিন বস্ত্র বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হত।

সার-সংক্ষেপ

মুঘল আমলে কৃষি রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল। তখন কৃষিপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর দাম কম ছিল। এ আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। ফলে জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল।

পাঠোরত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. গুলবদন বেগম লিখিত গ্রন্থের নাম —
   ক. বাবরনামা খ. হুমায়ুননামা
   গ. আইন-ই-আকবরী ঘ. ফতুয়ে বুলদান

২. মুঘল আমলে সাম্রাজ্যের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল —
   ক. ব্যবসা-বাণিজ্য খ. খনিজ সম্পদ
   গ. শিল্প ঘ. কৃষি

৩. সম্রাট আকবরের আমলে টাকায় গম পাওয়া যেত —
   ক. ২০ মন খ. ১৫ মন
   গ. ১০ মন ঘ. ৫ মন

৪. ভারতবর্ষে মসলিন বস্ত্র উৎপাদিত হত —
   ক. মাদ্রাজে খ. বাংলায়
   গ. বিহারে ঘ. মুম্বাইয়ে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. মুঘল আমলে কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল?
২. মুঘল শাসকদের বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ ১২

মুঘল যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুঘল যুগের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুঘল যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলার উন্নতির উল্লেখ করতে পারবেন।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান

সামাজিক অবস্থাঃ মুঘল যুগে সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজব্যবস্থা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মধ্যবিত্ত ও অভিজাত, অন্যটি নিম্নবিত্ত বা সাধারণ শ্রেণী। সম্রাট ছিলেন সমাজের প্রধান। তবে ১৬ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমাজে আর একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। বণিক, ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতি পেশার মানুষ নিয়ে গড়ে উঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। অভিজাত শ্রেণী সম্রাটের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। তারা সম্রাটের নিকট থেকে জায়গীর লাভ করতেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ছিল অনাড়ম্বর। দোকানদার, বনিক, চিকিৎসক, লেখক ছিলেন এই শ্রেণীভুক্ত। তাদের অভিজাত শ্রেণীর সমকক্ষ সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সমাজ জীবনের নিম্নস্তরে ছিল কৃষক ও মজুর শ্রেণী। এরা সংখ্যায় অধিক হলেও সামাজিক কোন প্রতিপত্তি ছিল না। অর্থ কষ্টে তাদের দিন অতিবাহিত হত।

ধর্মীয় উদারতার পাশাপাশি হিন্দু সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কারের উপস্থিতি এবং নারীদের প্রতি অনুদারতা

মুঘল আমলে হিন্দু ও মুঘলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দুদের স্বাধীনতা ছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল। তদানিন্তন হিন্দু সমাজে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল। মুঘল আমলে সাধারণ নারীদের অবস্থা উন্নত ছিল না। সমাজে নারীদের অগ্রগতির পথে অনেক বাধা ছিল। অভিজাত শ্রেণী হারেম রাখত এবং হারেমে বহু দাসী ও পরিচারিকা নিয়োগ করা হতো। এ আমলে নারী পুরুষ উভয়ই স্বর্ণ ব্যবহার করত। চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত, দাবা, পাশা খেলা, পোলো, রথ দৌড়, সাঁতার ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্য

শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা

শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুঘল শাসনামল ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মুঘল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আকবরের সময় শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগ সূচিত হয়। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব শিক্ষানুরাগী ছিলেন। মক্তব, মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের টোল প্রভৃতি ছিল সে আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় শাসক ও জমিদারগন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময়ে আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। মুঘল আমলে রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সী।

সাহিত্য সৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষকতা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগ ছিল গৌরবময়। মুঘল সম্রাটগণ অনেকেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধশালী হয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এ যুগ ছিল উলেস্নখযোগ্য। মুঘল আমলে হিন্দুস্থানী সাহিত্য এবং বাংলাভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এ যুগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এ সময়ে উর্দু সাহিত্যও উৎকর্ষ লাভ করে।

শিল্পকলার উন্নতি

ধর্মীয় জীবনঃ মুঘল আমলে ধর্মীয় উদারতা বিদ্যমান ছিল। মুঘল সম্রাট আকবর দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মমত চালু করেন। সামরিক সুফল পেলেও ধর্মপ্রান মুঘলমানরা আকবরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সমাজে হিন্দু মুসলিম ছাড়া শিখ এবং বৈদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রধান ছিলেন। এ সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে দারুন ধর্মীয় ঐক্য ছিল। ১৬ শতকের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব সপ্তম শতাব্দীর মুঘল আমলেও পরিলক্ষিত। এ সময় মুযাদ্দিদ-ই-আলফে সানী নামক ধর্মীয় নেতা ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মুঘল আমলে বহু বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। দিলস্নীর মতি মসজিদ, জামে মসজিদ আজও মুঘল কীর্তি বহন করছে।

সার-সংক্ষেপ

মুঘল সমাজ ছিল সামন্তান্ত্রিক। সম্রাট ছিলেন এ সমাজ ব্যবস্থার প্রধান। এ সমাজে তিন শ্রেণীর লোক বাস করতেন এবং এদের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে মুঘল যুগের অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্যও এ যুগে উৎকর্ষ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১২

নৈর্ব্যক্তিত প্রশ্ন:

১. মুঘল আমলের সমাজ ব্যবস্থায় বাস করত —

ক. অভিজাত খ. মধ্যবিত্ত

গ. নিম্নবিত্ত ঘ. ক, খ, গ.

২. মুঘল আমলের সামাজিক কুসংস্কারগুলো হচ্ছে —
   ক. বাল্যবিবাহ খ. সতিদাহ
   গ. বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ঘ. ক, খ, গ.

৩. মুঘল আমলের জগদ্বিখ্যাত শিল্পকীর্তি —
   ক. দিওয়ান-ই-আম খ. তাজমহল
   গ. মতি মসজিদ ঘ. দিওয়ান-ই-খাস

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মুঘল যুগের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?
২. মুঘল আমলের শিক্ষা-সাহিত্য ও পরিচয় দিন।
৩. মুঘল আমলের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা দিন।

পাঠ ১৩

মুঘল আমলের স্থাপত্য কলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুঘল সম্রাটদের স্থাপত্য শিল্পে অবদানের কথা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুঘল সম্রাটগণ স্থাপত্য শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুঘল স্থাপত্য শিল্পে পারসিক এমনকি ইউরোপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও অধুনা স্থাপত্য বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মুঘল স্থাপত্যকলা পারসিক ও ভারতীয় ধারার সংমিশ্রণ। তাছাড়া মুঘল স্থাপত্যে সুলতানি যুগের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এদেশের আঞ্চলিক প্রভাবও স্থাপত্য শিল্পে লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন সম্রাটের আমলে স্থাপত্যের বিকাশ

বাবরের ভূমিকা: সম্রাট বাবর কেবলমাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, তিনি শিল্পকলার ক্ষেত্রেও একজন অগ্রপথিক ছিলেন। তাঁর আমলে আগ্রায় একটি মসজিদ, পানিপথের কাবুলিবাগ নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।

হুমায়ুনের ভূমিকা: হুমায়ুনের আমলে দিল্লীতে দীন-পানাহ ভবন, আগ্রায় ও ফতেহাবাদে নির্মিত মসজিদ তাঁর শিল্পানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে।

আকবরের ভূমিকা: শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী আকবরের আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্য রীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত লাল পাথরের বিশেষ ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত ইমারতের বৃহদায়তন। আকবরের আমলে নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও সৌধগুলির মধ্যে ফতেহপুর সিক্রি, হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদতখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচ মহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিকান্দ্রায় নির্মিত অপূর্ব সমাধি সৌধটির পরিকল্পনা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদ ও বুলন্দ দরওয়াজা আজও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে। তাঁর আমলে শেখ সেলিম চিশতির সমাধিও নির্মিত হয়।

জাহাঙ্গীরের ভূমিকা: সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে আকবরের সমাধি সৌধ, ইতিমাদ্‌দৌলার সমাধি সৌধ এবং তাঁর নিজের জন্য নির্মিত সমাধি সৌধের নাম উল্লেখ করা যায়। শ্বেত পাথরের ব্যবহার এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহানের ভূমিকা: স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন অদ্বিতীয়। স্থাপত্য শিল্পে উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁর সময়কালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর নির্মিত ভবনগুলি শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, গুণে ও মানে সারা পৃথিবীতে অতুলনীয়। তিনি তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর অবিনশ্বর প্রেমের এক অনিন্দ্য সুন্দর সৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে আগ্রার মতি মসজিদ, দিল্লীর জামে মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস নির্মিত হয়। দিওয়ান-ই-খাসের অপূর্ব নির্মাণ শৈলী এবং শিল্পকর্মের চমৎকারিত্যের জন্য এটি 'দুনিয়ার বেহেস্ত' বলে অভিহিত। ভুবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন মনি-মুক্তা, হীরা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি। ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অন্যতম কীর্তি। তিনি 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটি নতুন শহরও নির্মাণ করেন যা বর্তমানে নতুন দিল্লী নামে পরিচিত। লাহোরে অবস্থিত সালিমার উদ্যান সম্রাটের স্থাপত্য রুচির অপরূপ নিদর্শন।

আওরঙ্গজেবের ভূমিকা: সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত লাহোরের বাদশাহী মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন। তিনি দিল্লীর দুর্গের ভিতরও একটি মসজিদ নির্মাণ করান।

চিত্রকলার প্রতিও মুঘলদের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হয়। পারসিক প্রভাবে উদ্ভূত মুঘল চিত্রশিল্প কালক্রমে ভারত ও ইউরোপীয় শিল্প রীতির সংমিশ্রণে উৎকর্ষ সাধন করে।

সার-সংক্ষেপ

মুঘল যুগে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রায় সব মুঘল সম্রাট স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকর্ষণীয় সৌধ, ইমারত, মসজিদ, উদ্যান এমনকি ময়ূর সিংহাসন মুঘলদের কীর্তির অবিনশ্বর স্বাক্ষর বহন করে। মুঘল যুগে চিত্রশিল্পও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. পানিপথের কাবুলিবাগ নামক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন —
   ক. জাহাঙ্গীর খ. আকবর
   গ. হুমায়ুন ঘ. বাবর

২. বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করান —
   ক. বাবর খ. হুমায়ুন
   গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

৩. তাজমহল অবস্থিত —
   ক. দিল্লীতে খ. ফতেহপুর সিক্রিতে
   গ. আগ্রায় ঘ. লাহোরে

৪. সম্রাট শাহজাহানের নিম্নলিখিত শিল্পকর্মকে 'দুনিয়ার বেহেস্ত' বলা হয় —
   ক. মতি মসজিদ খ. দিওয়ান-ই-আম
   গ. দিওয়ান-ই-খাস ঘ. তাজমহল

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য সমূহ কি ছিল?
২. স্থাপত্য শিল্পে মুঘল সম্রাটদের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

ভারতের মুঘল সম্রাটদের বংশ লতিকা

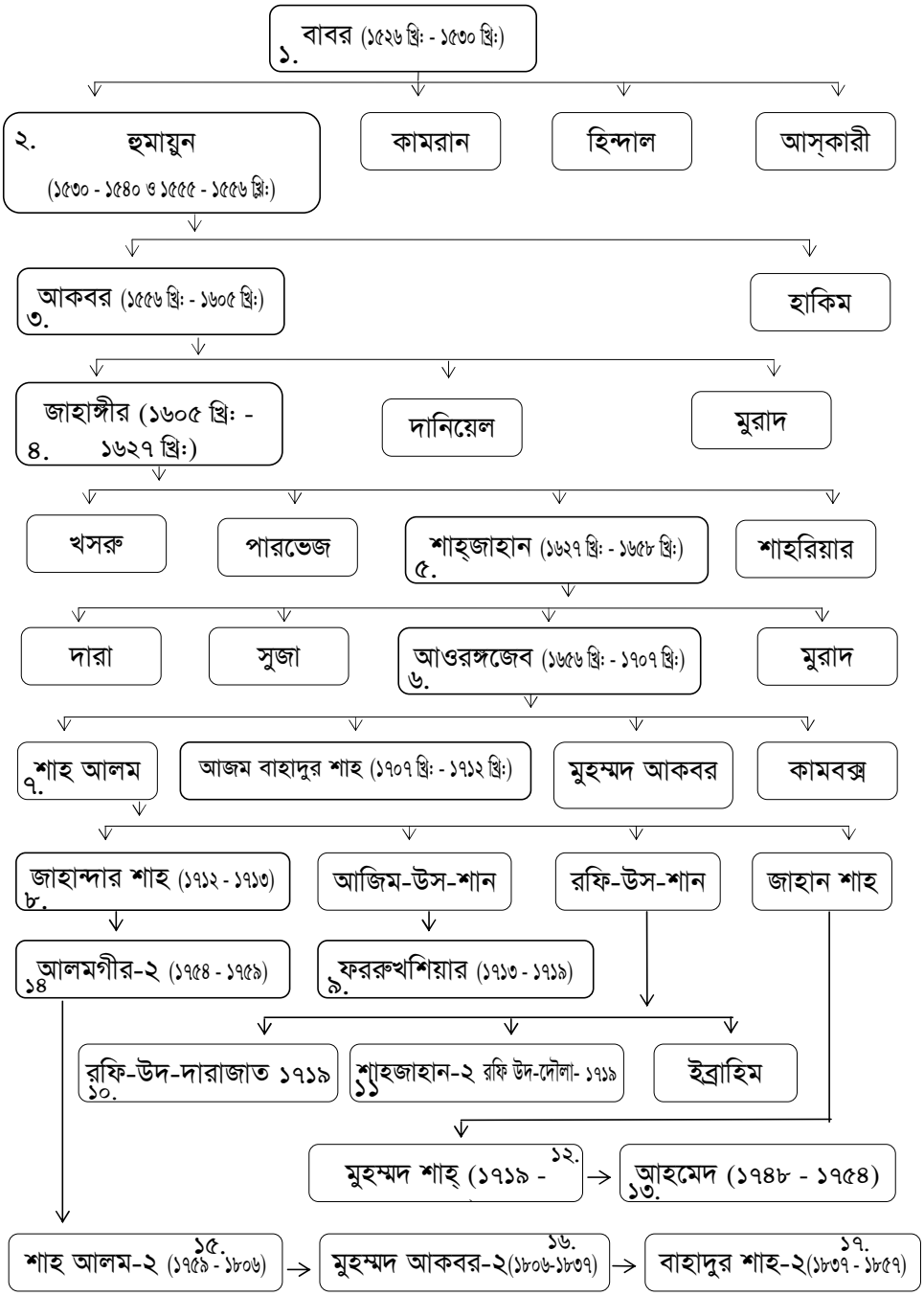

পাঠ ১৪

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুঘল সাম্রাজ্য পতনে বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ দিতে পারবেন।

১৫২৬ খ্রিঃ জহিরউদ্দিন বাবর কর্তৃক ভারতবর্ষে মুঘল আমলের সূত্রপাত ঘটে। বাবর থেকে আওরঙ্গজেব অর্থাৎ ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল শাসন ছিল স্বর্ণযুগের শাসন। ১৭০৭ খ্রিঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুরপর মুঘল শাসনের পতনের যুগ শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর ইংরেজ কর্তৃক নির্বাসিত হলে মুঘল শাসনের চির অবসান ঘটে। তাই ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭ সময় কালকে (প্রায় দেড়শ বছর) মুঘল বংশের পতনের যুগ বলা হয়। অতএব সামগ্রীক ভাবে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহিঃআক্রমন প্রভৃতি বিষয়কে দায়ী করা হয়।

মুগল সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী বিভিন্ন কারণ

১. **দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনঃ** মুঘল সাম্রাজ্য আকারে এবং আয়তনে বিশাল ছিল। তাই রাজ্য শাসনের জন্য ছিল যোগ্য শাসকের প্রয়োজন। কিন্তু আওরঙ্গজেব পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অযোগ্য। তাই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার মত কোন ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাদের ছিল না।

২. **উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অভাবঃ** মুঘল সিংহাসনে আরোহণের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কাজেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে মুঘলদের আত্মঘাতী সংগ্রাম কেন্দ্রীয় শক্তি এবং ঐক্য নষ্ট করে। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের এটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত।

৩. **অভিজাতদের দুর্বলতাঃ** অভিজাতগণের পারস্পরিক কলহ ও চারিত্রিক অবনতি মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। অভিজাত সম্প্রদায় এককালে মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পরবর্তী কালে তারা বিলাসপ্রিয় এবং কোন্দল পরায়ণ হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের ভিত ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৪. **সামরিক বাহিনীর দুর্বলতাঃ** সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুর্বল সম্রাটগণের আমলে সামরিক শক্তি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। বিভিন্ন জাতির সমবায়ে মুঘলদের বিশাল সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। দুর্বল শাসকদের আমলে সেনাবাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিলাসিতা ও চারিত্রিক অবনতির ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। মুঘলদের নৌশক্তির দুর্বলতার দরুনও সাম্রাজ্যের পতন অবিশ্বম্ভাবী হয়ে পড়ে।

৫. **আর্থিক সংকটঃ** বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা ও সেনাবাহিনী পোষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। তাছাড়া আওরঙ্গজেবের দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনার ফলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। অথচ দুর্বল শাসকদের আমলে আয়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই আর্থিক দুরবস্থা সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৬. **আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ অবস্থান:** আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে রাজধানী থেকে তাঁর অনুপস্থিতি শাসন ব্যবস্থাকে অনেক দিক থেকে দুর্বল করে দেয়। ফলে এ সময়ে উত্তর ভারতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যা সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করে।

৭. **বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ:** আওরঙ্গজেবের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে মারাঠা, শিখ, জাঠ, রাজপুতদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ মুঘল শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে।

৮. **প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা:** কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ দূরবর্তী প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি হুমকির সম্মুখিন হয়।

৯. **জাতীয়তাবোধের অভাব:** মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সমর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, গণ সমর্থনের উপর নয়। মুঘল সম্রাটগণ এদেশের জনগণকে এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি। তাই অভিন্ন জাতীয়তাবোধের অভাবে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখা দেয়।

১০. **বিদেশী শক্তির আক্রমণ:** উপরে উল্লিখিত কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখন পারস্য সম্রাট নাদিরশাহ এবং পরবর্তী কালে আফগানরাজ আহমদ শাহ আবদালীর দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠনে সাম্রাজ্যের অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে উঠে। এমনি মুমূর্ষ অবস্থায় ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা দখল করার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে (বার্মা) নির্বাসিত করেন। বাহাদুর শাহের নির্বাসনের মধ্য দিয়ে ভারতে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে। এই সময় কোম্পানী শাসনের বিলুপ্তি এবং ভারত বর্ষে ব্রিটিশ রাজ শাসনের সূত্রপাত হয়।

সার-সংক্ষেপ

মুঘল সাম্রাজ্য আকারে এবং আয়তনে বিশাল ছিল। এমনি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যোগ্য শাসকের প্রয়োজন। অথচ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ দুর্বল, বিলাস প্রিয় ছিলেন। এই কারণ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. মুঘল বংশের শেষ সম্রাট —
   ক. ফররুখ শিয়ার খ. মুহম্মদ শাহ
   গ. শাহ আলম ঘ. বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়)

২. নাদির শাহ সম্রাট ছিলেন —
   ক. আফগানিস্তানের খ. পারস্যের
   গ. তুরস্কের ঘ. মিশরের

৩. মুঘল রাজত্বের শেষের দিকে ভারতবর্ষ আক্রমণকারী আফগান রাজ —
   ক. নাদিরশাহ খ. রেজা শাহ
   গ. দোস্ত মোহাম্মদ ঘ. আহমদ শাহ আবদালী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য আওরঙ্গজেব কতটুকু দায়ী ছিলেন?

২. মুঘল সাম্রাজ্য পতনে বৈদেশিক আক্রমণ সমূহের ভূমিকা কি ছিল?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৩ ঃ রচনামূলক প্রশ্ন:

১. সম্রাট আকবরের উত্তর ভারত বিজয়ের বিবরণ দিন।

২. সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা ও দাক্ষিণাত্য অধিকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।

৩. সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

৪. সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

৫. সম্রাট আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের বিবরণ দিন।

৮. সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৯. সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ও এর ফলাফল আলোচনা করুন।

১০. সম্রাট আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব বিচার করুন।

১১. মুঘল আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিচয় দিন।

১২. মুঘল আমলের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন।

১৩. মুঘল আমলের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের বিবরণ দিন।

১৪. মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বিবরণ দিন।

১৫. মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণ সমূহ লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তরমালা:

পাঠ - ৩.১ ⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ	৬. ঘ	৭. গ
পাঠ - ৩.২ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ				
পাঠ - ৩.৩ ⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. খ			
পাঠ - ৩.৪ ⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. খ			
পাঠ - ৩.৫ ⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ				
পাঠ - ৩.৬ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. গ	৫. ঘ		
পাঠ - ৩.৭ ⇒	১. ঘ	২. গ	৩. ঘ				
পাঠ - ৩.৮ ⇒	১. খ	২. গ	৩. খ				
পাঠ - ৩.৯ ⇒	১. ঘ	২. গ	৩. গ				
পাঠ - ৩.১০ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ				
পাঠ - ৩.১১ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ			
পাঠ - ৩.১২ ⇒	১. ঘ	২. ঘ	৩. খ				
পাঠ - ৩.১৩ ⇒	১. ঘ	২. গ	৩. গ	৪. গ			
পাঠ - ৩.১৪ ⇒	১. ঘ	২. খ	৩. ঘ				